জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রী বরুণকুমার চক্রবর্তী, কার্যনির্বাহী সম্পাদক ও সদস্য,
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র
শ্রী জয় গোস্বামী, প্রকাশনা সম্পাদক,
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র
শ্রী কৌশিক বসাক, বিশেষ সচিব ও সংস্কৃতি অধিকর্তা,
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রী কৌস্তভ তরফদার, সচিব,
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

প্রথম প্রকাশ ।। জানুয়ারি ২০২৩
ISBN : 978-81-89956-82-0
প্রচ্ছদ □ অভিজিৎ চক্রবর্তী

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে
কৌস্তভ তরফদার, সচিব, কর্তৃক 'লোকগ্রাম', ছিট-কালিকাপুর, কলকাতা ৭০০০৯৯ থেকে
প্রকাশিত এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
গঙ্গানগর, কলকাতা ৭০০১৩২ হইতে মুদ্রিত

মূল্য □ ৬০০ টাকা

প্রস্তাবনা

এ পর্যন্ত জেলার লোকসংস্কৃতি পরিচিতি জ্ঞাপক যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতি পরিচিতি জ্ঞাপক গ্রন্থটি সর্ববৃহৎ। সর্বমোট ৩২টি আলোচনা প্রকাশিত হল, যেগুলিতে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশেষত ভৌগোলিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ জেলাটির পুরাবৃত্ত, কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচার, হিন্দু-মুসলিম সমাজের লোকায়ত জীবন, এই জেলার খ্রিস্টান সমাজে প্রচলিত ধাঁধা, ছড়া, এতদঞ্চলের মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবিকা, লোকভাষা, পুতুলনাচ, এই জেলায় এখনও ব্যবহৃত হয় যেসব লৌকিক মন্ত্র, লৌকিক দেব-দেবী, লোকগান, লোকখাদ্য, বনবিবি পালার বিশেষত্ব, এই জেলার লোকঅস্ত্র, লোকতৈজস, লোকবিশ্বাস, ব্যবহৃত আভরণাদি, লোকযান, ব্রতপার্বণ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন, লোককথা আলোচিত হয়েছে। শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অধিবাসীদেরই নয়, অন্য জেলার মানুষজনের কাছেও বর্তমান গ্রন্থটি আকর্ষণীয় বলে বোধ হবে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমরা সর্বাত্মক সহায়তা লাভ করেছি এই জেলারই ভূমিপুত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক সনৎ কুমার নস্কর মহাশয়ের কাছে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এজন্য তাঁকে জানাই হার্দিক অভিনন্দন এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

(জয় গোস্বামী)
প্রকাশনা সম্পাদক

- সুন্দরবনের বাঘ ও লোক-সংস্কৃতি ২৯৯
  প্রভুদান হালদার
- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকোৎসব গাজন ও সমাজ-সংস্কৃতি ৩১৬
  দেবব্রত নস্কর
- প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সমাজমানস ৩৫০
  পুরঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
- দক্ষিণ চবিশ পরগনার লোককথার অন্তর্লোক ৩৬৯
  মন্টু বিশ্বাস
- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকগান ৩৮১
  রজত কর্মকার
- ইতিহাসের ছায়াচারী কিছু জনশ্রুতি : প্রসঙ্গ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ৪১৪
  তপন বর
- দোখনো দেশের ব্রত-পার্বণ ৪২০
  কোয়েল চক্রবর্তী
- লোকবিশ্বাস ৪২৬
  মনোজিৎ অধিকারী
- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ৪৪৬
  পবিত্রকুমার মিস্ত্রী
- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকপ্রযুক্তি : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার ৪৫৯
  মনোরঞ্জন সরদার
- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকশিল্প : অতীত থেকে বর্তমান ৪৬৮
  তপন মণ্ডল
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা : লোকখাদ্য-দর্পণ ৪৮০
  সমরেশ ভৌমিক
- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকঅস্ত্র ও লোকতৈজস ৪৯৮
  অভিজিৎ মল্লিক
- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় ব্যবহৃত অলঙ্কার ৫০৭
  সুশান্ত মণ্ডল
- লৌকিক যান : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আলোকে ৫১২
  সৌরভ বেরা
- দক্ষিণবঙ্গের পুতুলনাচ : সংকট এবং সম্ভাবনা ৫১৮
  শুভ জোয়ারদার
- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বনবিবি মা পালার আঙ্গিক, ঐতিহাসিকতা ও নাটকীয়তা বিচার ৫২৫
  সৌমেন পুরকাইত

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

পবিত্রকুমার মিস্ত্রী

মানুষের জীবন পদে পদে নানা অনিশ্চয়তায় ভরা। রাস্তায় বেরিয়ে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না লক্ষ্যে পৌঁছাবোই বা বাড়ি ফিরে আসতে পারবোই। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না সফল হবোই। ডাক্তার রোগীকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলবেনই এ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। জীবনের এইসব হাজারো অনিশ্চয়তাকে অতিক্রমণের জন্য আমরা আমাদের মতো করে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি— তার একটি হল বিশ্বাস, আর বিশ্বাস দৃঢ় হলে তা সংস্কার। 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে ড. আশরাফ্ সিদ্দিকী বলছেন— "আমি যা বিশ্বাস করি তাই belief বা বিশ্বাস আর আমি যা বিশ্বাস করি না তাই Superstition বা সংস্কার।"[১] বক্তব্যটি পুরোপুরি সমর্থন যোগ্য নয়। কারণ এখানে সংস্কার বলতে মূলত কু-সংস্কারকে বোঝানো হয়েছে। আমরা জানি সংস্কারের সু-কু দুটি দিকই আছে। একজন Individual যখন একটি সংস্কার মেনে চলে না তখন তার কাছে ওই সংস্কারটি Superstition বা কু-সংস্কার, যার কোনও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। কিন্তু লোকসমাজ সেই একই সংস্কার মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে বলেই তো মেনে চলে। তাদের কাছে উক্ত সংস্কারটি কিন্তু কু-সংস্কার নয়। আর আমরা জানি লোকসমাজে ব্যক্তির তুলনায় সমষ্টির গুরুত্ব বেশি। আমির তুলনায় আমরা গুরুত্বপূর্ণ। লোকসমাজ পরম্পরায় সংস্কারগুলি মেনে চলে বলেই তা আজও টিকে আছে। ব্যক্তিবিশেষের সংস্কার ক্ষণস্থায়ী কিন্তু লোক-সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী। লোকসমাজে তার মূল্য অপরিসীম।

ইংরেজি folk belief শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ লোক-বিশ্বাস, আর Superstition শব্দটির প্রতিশব্দরূপে লোক-সংস্কার শব্দটিকে বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এই অভিধা পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ Superstition শব্দটির আক্ষরিক অর্থ — অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার। এখন প্রশ্ন হল, লোকসমাজ ঐতিহ্যমণ্ডিতভাবে যে সমস্ত সংস্কার বংশানুক্রমিকভাবে মেনে আসছে তার সবগুলিই কি কু-সংস্কার? নিশ্চয়ই নয়। কিছু সংস্কারের সু-দিক অবশ্যই আছে। যেমন — কোনও শুভ কাজে বার হওয়ার আগে মা-বাবাকে প্রণাম করে যেতে হয়, বড়োদের প্রণাম করে বার হতে হয়। এটাকে কি কু-সংস্কার বলা যাবে? বোধহয় না। অনেকে হয়তো বলবেন হ্যাঁ, কারণ এর বিজ্ঞানসম্মত কারণ নেই। বিজ্ঞানের যোগ না থাক, মনোবিজ্ঞানের যোগ তো অস্বীকার করা যাবে না। প্রণাম করার ফলে বড়োদের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ অটুট থাকে, বড়োরা ছোটোদের যে স্নেহাশিস দেন তাকে আর যাই বলা যাক কু-সংস্কার বলাটা বাড়াবাড়ি হবে। তাছাড়া উক্ত কাজটির ফলে যে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায় তার প্রভাব পরবর্তী কার্যক্রমে পড়ে।

বিশ্বাস-সংস্কার শুধু গ্রাম্য অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর জনসমাজেই আছে এমনটি ভাবা ঠিক নয়। শহরের সু-শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বাড়ির সন্তানটিও পরীক্ষার হলে প্রশ্ন পেয়ে মাথায় ঠেকায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বিখ্যাত বাঙালি ক্রিকেটার খেলায় সাফল্য লাভের আশায় গলায়, হাতে তাবিজ কবচ ধারণ করেন। বাড়ির পুজোর ফুল, প্রসাদ সঙ্গে করে নিয়ে বিদেশ সফরে যান। অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার আগে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকও অপারেশনের সরঞ্জাম মাথায় ঠেকান। "সুসভ্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানে সুউন্নত সমাজে পর্যন্ত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের প্রভাব আজও বিদ্যমান— বহু ক্ষেত্রে এগুলোকে চেষ্টা করেও সমাজদেহ থেকে সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হয়নি, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইচ্ছায় বর্জনের কোনো চেষ্টাই হয়নি।"[২]

সাধারণভাবে মনে হয় লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার এক ও অভিন্ন। কিন্তু তা ঠিক নয়। দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। লোকসাধারণ বা সংহত সমাজ যে সমস্ত আচার-আচরণ, কাজকর্মকে উচিত-অনুচিত মনে করে, যার সঙ্গে তাদের ভালো-মন্দের শুভ-অশুভের বোধ সম্পর্কিত তাই হল লোকবিশ্বাস। কিন্তু লোকসমাজ যখন শুধু বিশ্বাস করে ক্ষান্ত না হয়ে তাদের জীবনচর্যায় যেগুলি মেনে চলে সেগুলি সংস্কার। বলা যায় বিশ্বাস হল মানসিক, সংস্কার তার ফলিত রূপ বা ব্যবহারিক। বিশ্বাস হল Concept, সংস্কার Applied। বিশ্বাস না থাকলে সংস্কার হবে না, সংস্কার গড়ে উঠবে না। যেমন রাতের বেলা সূঁচ দিতে নেই। এটা বিশ্বাস। এই লোকবিশ্বাসে বিশ্বাসী দোকানি যখন রাতে সূঁচ চাইতে আসা খরিদ্দারকে না দিয়ে ফিরিয়ে দেয় তখন সেটি সংস্কারে পর্যবসিত হয়। ফলত বলা যায় সংস্কারের মূলে আছে বিশ্বাস। বলা যায় বিশ্বাস থেকে সংস্কার উদ্ভূত। তবে সব লোকবিশ্বাস থেকে সংস্কারের উদ্ভব হয়, এমনটি মোটেও নয়। কোনও কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাস সাম্প্রতিককালে তৈরি হতে পারে। কিন্তু সংস্কার বলতে আমরা সেগুলিকেই বুঝব যেগুলি দীর্ঘদিন প্রজন্ম পরম্পরায় লোকসমাজ মেনে আসছে।

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার সৃষ্টির পিছনে নানা কারণ থাকতে পারে। কখনো কখনো এগুলির সৃষ্টির মূলে ধর্মীয় কাহিনি ও নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন শ্রাবণ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই সংস্কারের মূলে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনিকে মান্যতা দেওয়া হয়। শ্রাবণ মাসে বিবাহ হওয়াতে বেহুলা যেভাবে স্বামীকে হারিয়েছিল, শ্রাবণ মাসে বিবাহ হলে অন্য নারীর জীবনেও অনুরূপ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে এই বিশ্বাস থেকে এমন সংস্কার সৃষ্টি।

এক একটি সংস্কারের পিছনে যে যুক্তি বা কারণ দেখানো হয় বা বলা হয় তা বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে সংস্কারের যুক্তিযুক্ত কারণটি সহজে অনুধাবন করা যায়। যেমন — বালিশ ডিঙোতে নেই বা বালিশে বসতে নেই। তাতে নাকি যে বসে তার পাছায় ফোঁড়া হয় বা যার বালিশ তার ঘাড়ে ব্যথা হয়। এই যুক্তি হাস্যকর, বিজ্ঞানসম্মত নয় ঠিকই। আসলে বালিশে বসলে বালিশ চেপে যাওয়ার বা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বালিশ ডিঙোতে গেলে পা বেধে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে — তাই ভয় দেখিয়ে বালিশে বসা বা ডিঙানো বন্ধ করার জন্য এমন সংস্কার সৃষ্টি। এমনি বললে তো কেউ মানবে না তাই ভয় দেখিয়ে রাখা। কে না জানে ভয় থেকেই তো ভক্তি।

বিশ্বাস-সংস্কারকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় আটকে রাখা যায় না, তা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার লোকবিশ্বাস সংস্কারের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারের বিরাট কিছু পার্থক্য নেই। তবুও দু-একটি কারণে

কিছু পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়। যেমন এই জেলার জনজীবনের ওপর সুন্দরবন ও নদ-নদী, সাগরের বিরাট ভূমিকা, যা অন্য জেলার ওপর অতটা প্রভাবশীল নয়। চাষাবাদ, নদী-নালা-সমুদ্রে মাছ ধরা, জঙ্গলে মোম-মধু সংগ্রহ, মাছ-কাঁকড়া ধরা, এই সমস্ত জীবিকাগত কারণে কিছু বিশ্বাস-সংস্কার থাকে যা অন্য জেলায় হয়তো সহজে চোখে পড়ে না। এবারে আমরা এই জেলায় প্রচলিত লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কারের স্বরূপটি বুঝে নেব।

বৃষ্টি ও কৃষিকাজ সম্পর্কিত— দক্ষিণ ২৪ পরগনার সিংহভাগ মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। তাই বৃষ্টিপাত, কৃষিকাজ সংক্রান্ত নানান লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের প্রচুর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন —

১। শনির সপ্তা মঙ্গালের তিন
একে বুধে পনের দিন
আর সব দিন দিন।

অর্থাৎ শনিবার বৃষ্টিপাত শুরু হলে তা টানা এক সপ্তাহ চলবে বলে লোকবিশ্বাস, একইভাবে মঙ্গলবারে বৃষ্টি শুরু হলে টানা তিনদিন চলতে পারে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে বৃষ্টিপাত শুরু হলে তা দিনের দিন থেমে যায় বলে বিশ্বাস।

২। টানা বেশিদিন প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হলে উঠানে পিঁড়ে চিত করে নোড়া চাপা দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস ঝোড়ো ঠাকুর এতে তুষ্ট হন এবং ঝড়-বৃষ্টি থেমে যায়।

৩। বৃষ্টিপাত থামাতে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়। দুটো ব্যাঙকে তেল হলুদ সিঁদুর মাখিয়ে বিয়ে দিতে হয়।

৪। অতিবৃষ্টি থামাতে ছোটোরা অনেকসময় ছড়া আবৃত্তি করে—

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে
নেবুর পাতায় করমচা
যা বৃষ্টি ধরে যা।

৫। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে পুকুরের জলে বড়ো বড়ো বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি হলে মনে করা হয় আরও জোরে বা বেশি বৃষ্টি হবে।

৬। সোনা ব্যাঙ ঘন ঘন ডাকলে বৃষ্টি হয়। ব্যাঙ গাছে উঠলে বৃষ্টি হবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

৭। অম্বুবাচীর দিন অর্থাৎ ৭ আষাঢ় থেকে পরপর তিনদিন জমিতে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। বিশ্বাস করা হয় ওই সময় বসুমতী বা পৃথিবী ঋতুমতী হয় তাই পৃথিবীকে কোনো আঘাত করতে নেই।

৮। অম্বুবাচীর দিন আবশ্যিকভাবে নিরামিষ খেতে হয় এবং আম ও দুধ খেতে হয়।

৯। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় লাঙল চষা নিষেধ। বিশ্বাস এই যে এই দুই তিথিতে হাল চালালে বলদের পায়ে বাত হয়।

১০। পরিবারের কারো গায়ে ফোঁড়া হলে সেই বছর ফসল ভালো হবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

১১। শুভ বার ও শুভ তিথি দেখে চাষের কাজ করলে ফসল ভালো হয়ে থাকে। সোম ও শুক্রবার চাষের পক্ষে আদর্শ বলে মনে করা হয়। বলা হয়— 'সোমে শুক্রে চাষবাস'। আবার শনি মঙ্গলবারে চাষের কাজ শুভ বলে কেউ কেউ মনে করেন।

১২। ধান চাষের কাজ মূলত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে হলেও নববর্ষের প্রথম মাস অর্থাৎ বৈশাখ মাসের নির্দিষ্ট শুভ দিনে জমিতে প্রথম লাঙল দেয় কৃষকরা। গোবুর কপালে সিঁদুর দিয়ে শুদ্ধ চিত্তে জমিতে প্রথম হলকর্ষণ করা হয়।

মাছ ধরা সংক্রান্ত— ভৌগোলিক কারণেই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রচুর নদ-নদী, সাগর, খাল-বিল-পুকুরের দেখা মেলে। মাছ ধরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ এই জেলার মানুষের অন্যতম একটি পেশা। আর অন্যান্য সব পেশার মতোই এই পেশার মানুষেরা আলাদা করে কিছু বিশ্বাস-সংস্কার মেনে চলে। তার মধ্যে দু-একটির নমুনা দেওয়া যাক।

১। মৎস্যজীবীদের উপাস্য দেবতা মাকাল ঠাকুর। পুকুর সেঁচে মাছ ধরার সময় মাকাল ঠাকুরের উদ্দেশে পুকুরপাড়ে ছোটো মাটির স্তূপ বানিয়ে চাল-কলা-বাতাসা দেওয়া হয়। বিশ্বাস মাকাল ঠাকুর খুশি হয়ে বেশি মাছ দেবেন।

২। বাদাবন অঞ্চলের অন্যতম আদিম লোকদেবতা আটেশ্বর। আটেশ্বর গ্রামের মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করেন এই বিশ্বাস গ্রামবাসীদের। অন্যান্য লোকদেবতার পাশাপাশি আটেশ্বর-এর পূজা করে খুশি করতে হয়। এই দেবতার পূজার অন্যতম উপকরণ হল গাঁজা।

৩। নদীতে বা সমুদ্রে মাছ-ধরা মৎস্যজীবীরা নৌকা ও ট্রলারের গলুই মাথায় পা দেয় না এবং কাউকে দিতেও দেয় না। গলুই মাথা পবিত্র বলে লোকবিশ্বাস।

৪। শুক্রবারে নৌকায় মাছ খাওয়া নিষেধ। কারণ বনবিবি শুক্রবারে রোজায় থাকেন বলে লোকবিশ্বাস।

৫। সন্ধ্যার পর মাছ ধরার গল্প করতে নেই, করলে ভূতের উপদ্রব হয়।

৬। নৌকায় উপুড় হয়ে শুতে নেই। নৌকার খোলের আকৃতির সঙ্গে স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের সাদৃশ্য থাকায় এই বিধিনিষেধ।

৭। স্বামী-স্ত্রী মাছ ধরতে গিয়ে নৌকায় একসঙ্গে থাকলেও যৌনমিলনে লিপ্ত হতে নেই, হলে নৌকা অশুচি হয়ে যায়।

৮। সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে নৌকায় থাকাকালীন বাঘের ভয় কম বেশি সব মৎস্যজীবীরাই পায়। তারা বাঘকে বাঘ না বলে ফকিরের বন্ধু বলে। সূর্যকে বলা হয় ঘড়ি। খাওয়া না বলে বলে ভোজের কাজ সারা, ভাত-জল সরিয়ে রাখা ইত্যাদি।

৯। জেলেরা জঙ্গালে অবস্থানকালে তাদের বাড়ির মহিলারাও বিভিন্ন সংস্কার মেনে চলে। যেমন — তেল মাখে না, সিঁদুর পরে না। ঘর ঝাঁট দিয়ে ধুলো বাইরে ফেলে না। এর ফলস্বরূপ জলে জঙ্গালে অবস্থানরত বাড়ির পুরুষরা সুরক্ষিত থাকবে বলে বিশ্বাস।

যাত্রা (গমন) সম্পর্কিত — শুভ কাজে যাওয়ার জন্য শুভ দিন নির্বাচন করাটাও জরুরি। শুভ দিনক্ষণ না দেখে যাত্রা করলে যাত্রার উদ্দেশ্য সফল না-ও হতে পারে। এমনকি পথে বিপদ হতে পারে। তাই যাত্রা সম্পর্কিত একাধিক সংস্কারের দেখা মেলে। যেমন—

১। মঙ্গালে ঊষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা।

অর্থাৎ মঙ্গালবারের রাত ভোর হওয়ার পর বুধবারের সকাল যাত্রার পক্ষে আদর্শ।

২। শনি মঙ্গাল বার কোথাও যাত্রা করা নিষিদ্ধ। যাত্রা ফলপ্রসু হয় না।

৩। যদি পায় রাজ্যদেশ
তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ।

বৃহস্পতিবার বারবেলায় কোথাও যাত্রা করতে নেই।

৪। কোথাও যাওয়ার সময় মেয়েদের ক্ষেত্রে আগে বাঁ পা ফেলতে হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে আগে ডান পা ফেলে যাত্রা শুরু করতে হয়।

৫। কোথাও বের হওয়ার আগে মাথায় ধাক্কা লাগলে বা পায়ে হোঁচট লাগলে একটু অপেক্ষা করে যাত্রা করতে হয়।

৬। যাত্রাকালে কেউ পেছন থেকে ডাকলে তার ডাকে সাড়া দিতে নেই, যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয় না। কিন্তু মা ডাকলে শুনতে হয়, একটু দাঁড়িয়ে যেতে হয়। কেননা মায়ের ডাক শুভ।

৭। তিনজনে একসঙ্গে বেরোতে নেই, কাজ সফল হয় না।

৮। পায়ের তলা চুলকালে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার যোগ থাকে বলে লোকবিশ্বাস।

৯। মাছের জাল দেখে যাত্রা করতে নেই।

১০। ছাগলের কাননাড়া, গোরুর কাশ
বিড়ালের হাঁচি করে সর্বনাশ। — যাত্রাকালে এগুলো দেখা অশুভ।

নজর লাগা সম্বন্ধীয় :

১। ক্ষেতে কারো নজর না লাগে সেজন্য খড় ও লাঠি দিয়ে মানুষের অবয়ব বানিয়ে তার মাথায় মাটির বড়ো ভাঁড় দিয়ে ভাঁড়ের ওপর মানুষের বড়ো বড়ো চোখ মুখ এঁকে দিতে হয়। কখনো শুধু লাঠির মাথায় চুন কালি দিয়ে আঁকা মাটির হাঁড়ি টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

২। শিশুর যাতে নজর না লাগে সেজন্য শিশুর কোমরে কালো সুতো বাঁধতে হয়। বর্তমান সময়ে পায়ের গোছে কালো সুতো বাঁধার চল বহুল প্রচলিত।

৩। ছোট্ট শিশুর কোমরে মাছ ধরা জালের একটি কাঁটি ঘুনসির সঙ্গে বেঁধে দিতে হয়। আঁশটে লোহার কাঁটি ভূত-প্রেতের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করে।

৪। কারো নজর লাগার ফলে শিশু যদি খেতে না চায়, দিন দিন দুর্বল হতে থাকে তাহলে শুকনো লঙ্কা আগুনে পুড়িয়ে শিশুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার টানা দিতে হয়।

৫। নতুন বাড়ি তৈরির সময় বাড়ির ভিতে লাঠির মাথায় ছেঁড়া জুতো, ঝাঁটা, চুপড়ি টাঙিয়ে রাখতে হয়, তাতে লোকের কু-দৃষ্টি আটকানো যায়।

৬। শিশুর হাতে বা পায়ে লোহার মল অর্থাৎ বালা পরাতে হয়, এতে অন্যের কু-দৃষ্টির হাত থেকে শিশুকে সুরক্ষিত রাখা যায়।

৭। শিশুকে বাড়ির বাইরে বের করার আগে মাথায় একটু নুন দিতে হয় এবং শিশুর কড়ে আঙুলটি আলতো করে কামড়ে দিতে হয়।

৮। সন্ধ্যার পর শিশুদের জিনিসপত্র বাইরের টানায় ঝুলিয়ে রাখতে নেই।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সম্বন্ধীয় — মানুষের জীবনের সব থেকে বেশি অনিশ্চয়তাময় এই তিন ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের সংখ্যাও কম নয়।

১। হাতে বা পায়ে পাঁচটির অধিক আঙুল নিয়ে জন্মানো পুত্র সন্তান সৌভাগ্যবান হয়।

২। বৃহস্পতিবারে কন্যা সন্তান জন্মালে কন্যাটি লক্ষ্মীমন্ত হয়।

৩। শনি, মঙ্গলবার ভরা দুপুরবেলা কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তি দোষ পায়। সেক্ষেত্রে পুরোহিত ডেকে নির্দিষ্ট আচার মেনে দোষ খণ্ডন করতে হয়।

৪। মৃতদেহ একা ফেলে চলে যেতে নেই।

৫। ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক এই তিনমাস হল মলমাস। মলমাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। পৌষ ও চৈত্র মাসেও বিবাহ হয় না।

৬। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ হয় না।

৭। কোনও পুরুষের পরপর দুজন স্ত্রী গত হলে তৃতীয়বার বিয়ের আগে কলাগাছের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তারপর তৃতীয় বিবাহে অগ্রসর হতে হয়।

৮। অবিবাহিত ছেলে মেয়ের গায়ে প্রজাপতি বসলে তাদের শীঘ্রই বিবাহযোগ থাকে।

৯। জন্মবার ও জন্মমাসে বিবাহ হয় না।

১০। গায়ে-হলুদের কাপড় খুব সাবধানে তুলে রেখে দিতে হয়। এমনকি ধোপার বাড়ি পাঠাতেও নেই। ওই কাপড়ের একটা সুতোও যদি কেউ পায় তাহলে তুকতাক করতে পারে, ফলে দম্পতির ক্ষতি হতে পারে।

১১। বিয়ের দিন দুধে আলতা গোলা জলে মোনা-মুনি ভাসিয়ে দেওয়া হয়, মোনামুনি যত দ্রুত জোড়া লাগবে তত দ্রুত নব-বিবাহিত দম্পতির মিল হবে বলে বিশ্বাস।

সু ও কু-লক্ষণ সম্বন্ধীয় — দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার লোকসমাজে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর শারীরিক গঠন, অবস্থা, কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচুর লোকবিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত। যেমন—

১। মায়ের মতো দেখতে ছেলেরা সুখী হয় বা ভালো হয়। আর কন্যাসন্তান বাবার মতো দেখতে হলে সুখী হয়।

২। খড়মপেয়ে মেয়ে বিয়ে করা ঠিক নয়। খড়ম পা বলতে যার পায়ের তলার মাঝখানটা অনেকটা বেশি ফাঁকা। দাঁড়ানো অবস্থায় পায়ের তলায় বেশি ফাঁকা থাকার জন্য একপাশ থেকে অন্যপাশে আলো দেখা যায়। এককথায় যে সব নারীর পায়ের মধ্যভাগ মাটিতে স্পর্শ করে না খড়মের মতো উঁচু হয়ে থাকে তাদের খড়মপেয়ে বলা হয়। আগে বিবাহের জন্য পাত্রী নির্বাচনে যাওয়া ব্যক্তিরা পাত্রীকে হেঁটে দেখাতে বলতেন, পাত্রী খড়মপেয়ে কিনা তা পরখ করে নেওয়ার জন্য। খড়মপেয়ে নারী অহংকারী, মুখরা ও দজ্জাল হয়ে থাকে বলে লোকবিশ্বাস।

৩। ছেলেদের ডান চোখ লাফানো শুভ, বাঁ চোখ লাফানো খারাপ। মেয়েদের ক্ষেত্রে এর উল্টো — বাঁ চোখ লাফানো শুভ, ডান চোখ অশুভ। পুরুষ নারীর হাত চুলকানোর ক্ষেত্রেও এই একই পর্যায়ক্রমিক বিশ্বাস প্রচলিত।

৪। ছেলেদের জোড়াভুরু সৌভাগ্যের। মেয়েদের ক্ষেত্রে আবার জোড়াভুরু অশুভ।

৫। রাতে বেড়াল, কুকুরের কান্না অশুভ ইঙ্গিত বহন করে। এইজন্য বেড়াল কুকুর কাঁদলে যে কোনও প্রকারে ওদের কান্না থামানোর চেষ্টা করা হয়।

৬। দুপুরবেলা ঘরের চালে দাঁড়কাকের ডাক অমঙ্গলজনক। রাতেও কাকের ডাক অলক্ষণ নির্দেশ করে।

৭। সাপের মিলন দেখা সৌভাগ্যের। সম্ভব হলে মিলন স্থলে নতুন গামছা বা শাড়ি পেতে দিতে হয়।

৮। সাপের স্বপ্ন দেখলে শুভ, বংশ বৃদ্ধি হয়।

৯। তেঁতুলের ফলন ভালো হলে সেই বছর ধানও ভালো হয়।

১০। আমের ফলন ভালো হলে সেই বছর ঝড়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

১১। সকালবেলা জোড়া শালিক দেখা শুভ, এক শালিক দেখা অশুভ।

১২। সকালে বা দিনের মধ্যে প্রথমবার এক চোখ দেখানো অশুভ। দুই চোখ দেখাতে হয়।

১৩। মাথার একদিকে ধাক্কা লাগলে আর একবার ইচ্ছাকৃতভাবে পরস্পরের মাথা স্পর্শ করতে হয়, না হলে একদিকে শিং গজায়।

১৪। জুতো উল্টে রাখা অশুভ। দেখা মাত্রই তা সোজা করে দিতে হয়।

১৫। ঝাঁটা কোঁস্তা উঠানের মাঝে পড়ে থাকা খারাপ। ওগুলো সরিয়ে যথাস্থানে রাখতে হয়।

১৬। কোনও ব্যক্তির নাম করতে করতে সেই ব্যক্তি যদি এসে উপস্থিত হয় তাহলে সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়।

১৭। কোনও ব্যক্তির মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটলে তার আয়ু বেড়ে যায়।

১৮। বাস্তুসাপ মারতে নেই। বাস্তুসাপকে মঙ্গলকারী প্রাণী হিসাবে দেখা হয়। পবিত্র প্রাণীকে হত্যা না করা এটি একটি মোটিফ। লোকবিশ্বাসের সঙ্গে এমন অনেক মোটিফের সম্পর্ক জড়িত। "থম্পসন-এর তালিকায় মোটিফটি হল 'Killing sacred animals' (C 92.1)। সাপের সঙ্গে রয়েছে বংশ-বিস্তারের যোগ। ... বাস্তুসাপের সঙ্গে বস্তুর মঙ্গল-অমঙ্গলের যোগ সম্পর্ক তাই কল্পিত।"*

গর্ভবতী রমণী ও প্রসূতির পালনীয় :

১। সন্তানসম্ভবা রমণীর মাছের ডিম খেতে নেই, খেলে একাধিক সন্তান হয়।

২। গর্ভবতী রমণীর শাক খেতে নেই, খেলে সন্তানের গায়ে প্রচুর লোম হয়।

৩। গর্ভবতী রমণী কিছু খাওয়ার ইচ্ছা জানালে তা পূরণ করতে হয়, নাহলে সদ্যজাত সন্তানের মুখ থেকে লালা পড়ে।

৪। গর্ভবতী রমণীর শনি-মঙ্গলবারে বাড়ির বাইরে বেরোতে নেই। সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে যেতে নেই।

৫। গর্ভবতী অবস্থায় সন্ধ্যার আগে চুল বেঁধে ফেলতে হয়। সন্ধার পরে চুল খোলা থাকলে দুষ্ট শক্তি ভর করে।

৬। গর্ভবতী অবস্থায় সূঁচ দিয়ে সেলাই করতে নেই। করলে গর্ভস্থ সন্তানের চোখ কানা হয়ে যায়।

৭। পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে জল খেলে গর্ভস্থ সন্তানের গায়ের রঙ ফর্সা হয়।

৮। গর্ভবতী রমণীকে গোরু-ছাগলের দড়ি ডিঙোতে নেই।

৯। গর্ভবতী রমণীকে পাঁচ মাস ও সাত মাসে সাধ ভক্ষণ করাতে হয়।

১০। গর্ভাবস্থায় সকালে ও সন্ধ্যায় খালি কলসি দেখতে নেই।

১১। গর্ভাবস্থায় রাতে একা বাইরে বেরোতে নেই। বেরোলে আগুন কিংবা লোহা সঙ্গে রাখতে হয়।

১২। গর্ভবতী রমণীকে মৃতদেহ দেখতে নেই। এতে সন্তানের অমঙ্গল হয়।

১৩। গর্ভের অষ্টম মাসে গর্ভবতী রমণীকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। এই সময় খাটের মতো উঁচু জায়গায় শোওয়া নিষেধ। ঘরের চৌকাঠ ডিঙোনো নিষেধ।

প্রতিকার ও উপশম সম্বন্ধীয় — ছোটো ছোটো ঘটনার প্রতিকার ও তা থেকে উপশম সংক্রান্ত প্রচুর বিশ্বাস সংস্কারের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন—

১। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের মাথায় মারতে নেই। মারলেও মাথায় ফুঁ দিয়ে দিতে হয়। তা না হলে তারা বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে।

২। কাউকে বাঁ হাত দিয়ে মারতে নেই। বাম হাতের চড় খেলে মার খাওয়া ব্যক্তি নাকি রোগা হয়ে যায়। যে মারে তার বাম হাতটি মাটিতে ঠুকতে হয়।

৩। বেড়ালকে ঝাঁটা দিয়ে মারতে নেই, মারলে প্রায়শ্চিত্ত করে দোষ খণ্ডন করতে হয়।

৪। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘাড়ে ব্যথা হলে পরদিন সকালে উঠে মাথার বালিশটা রৌদ্রে দিতে হয়, তাহলে ঘাড়ের ব্যথা সেরে যায়।

৫। চুল আঁচড়াবার পর চিরুনিতে ওঠা চুল বাম হাতে দলা পাকিয়ে তিনবার থু-থু-থু করে ফেলে দিতে হয় বা কোথাও গুঁজে রাখতে হয়, তাতে ওই চুল নিয়ে কালো জাদু প্রয়োগে কেউ ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

৬। চোখে আঞ্জুনি হলে কোনও ছোটো ছেলের পুরুষাঙ্গটি বোলালে আঞ্জুনি সেরে যায়।

৭। ঠান্ডা লেগে বাচ্চাদের চোখ লাল হলে স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ দিলে উপশম হয়।

৮। মায়ের আঁচল সন্তানের গায়ে লাগাতে নেই। সন্তানের আয়ু হ্রাস পায়। অসাবধানে লেগে গেলে আঁচল মাটিতে ঠেকিয়ে দোষ কাটাতে হয়।

৯। মুখে ব্রণ, ফুসকুড়ি উঠলে সকালে বাসিমুখে উঠে থুতু লাগালে ভালো হয়।

১০। শিশু বড়ো হয়ে যাওয়ার পরও রাতে বিছানায় প্রস্রাব করার অভ্যাস না ছাড়তে পারলে তার প্রতিকার স্বরূপ একটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেটি হল রাতে শুতে যাওয়ার আগে রান্না হয়ে যাওয়া মাটির উনুনের পাশে গিয়ে শিশুকে দাঁড়াতে বলা হয়। বলতে বলা হয় — দিনে মোতা সাতবার/রাতে মোতা একবার বা দিনে মোতা বারবার/রাতে মোতা একবার।

১১। খুব ভোরে ঘন ঘন বাজ পড়তে থাকলে উঠোনে পিঁড়ে উপুড় করে রাখা হয়। শিলনোড়া উঠোনের মাঝখানে রেখে আসা হয়। এছাড়াও বিদ্যুৎ ঝলকানির সঙ্গে সঙ্গেই লোকসমাজ বারবার রাম-সীতার নাম উচ্চারণ করে। লোকবিশ্বাস এর ফলে বাজ পড়া কমে যায়।

১২। বাড়িতে বাজ পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাড়ির ঈশান কোণে বাজবরণ গাছ লাগানোর সংস্কারও প্রচলিত। লোকবিশ্বাস এর ফলে বাড়িতে বাজ পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১৩। বারান্দা থেকে বাচ্চারা অসাবধানতাবশত পড়ে গেলে গ্লাসে করে জল এনে ঘরের খড়ের চালে জল ছুঁড়ে দিতে হয়। ওই জল পুনরায় ধরে বাচ্চাকে খাওয়ালে বাচ্চার কষ্ট লাঘব হয়, ক্ষতির সম্ভাবনা দূর হয়।

১৪। রাত্রে সাপের ভয় পেলে তিনবার 'আস্তিক' বলতে হয়। মনসাপুত্র আস্তিক মুনির আশীর্বাদে সাপ ওই ব্যক্তিকে রক্ষা করে বলে বিশ্বাস।

১৫। রাতে ভূতের ভয় থেকে বাঁচার জন্য ভীত ব্যক্তি বারবার রাম নাম জপ করে। মানুষ বিশ্বাস করে রাম নাম জপ করলে ভূত কাছে ঘেঁষার সাহস পায় না।

১৬। শিশুকে বাড়ির বাইরে বার করার আগে কপালে, পায়ের নীচে কালো কালির গোলাকার টিপ আঁকা হয়। এছাড়াও মা বা মাতৃস্থানীয়ারা শিশুর বাম হাতের কড়ে আঙুল কামড়ে দেয়, শিশুর মাথায় থুথু দেয়। বিশ্বাস এর ফলে শিশু সুরক্ষিত থাকবে। কারো কু-নজর লাগবে না। এঁটো

করে দিলে অনিষ্ট হয় না এই বিশ্বাস প্রচলিত।

১৭। গুটি বসন্ত হলে বলতে হয় 'মায়ের দয়া' হয়েছে। মা শীতলাকে পূজা দিলে, তাঁর কাছে মানত করলে রোগ নিরাময় হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। এর সঙ্গে কিছু আচারও পালন করা হয়। যেমন বাড়িতে আমিষ খাবার নিষিদ্ধ করা হয়। রোগীকে কলাপাতায় শুতে দেওয়া হয় ইত্যাদি। হাম হলে বলা হয় 'মাসি-পিসি' হয়েছে।

১৮। বাচ্চার পেট ব্যথা করলে পেটের ওপর কাঁসার গ্লাসে একগ্লাস জল ভরে ধরে রাখা হয়। কখনো কখনো ঠান্ডা মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়, আবার পুকুরের শীতল পাঁক এনে পেটে প্রলেপ দেওয়া হয়। এতে পেট ব্যথার উপশম হয়।

১৯। রক্ত আমাশয় হলে ছাগলের কাঁচা দুধের সঙ্গে কচি জামপাতা বেটে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

২০। আমরুল পাতার রস খেলে এবং থানকুনি পাতা বাটা খেলে আমাশয় নিরাময় হয়।

উপরোক্ত বেশ কিছু সংস্কার লোকচিকিৎসার অংশ হিসাবে স্বীকৃত। এমন প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যায় যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা তথা সমগ্র বঙ্গের মানুষ মেনে চলেন।

এবারে আসা যাক নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিশ্বাস ও সংস্কারে।

নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধীয় — মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত এটা করতে নেই ওটা করতে নেই এমন সংস্কারের ছড়াছড়ি। আমাদের আলোচ্য জেলায় প্রচলিত এমন কিছু বিশ্বাস ও সংস্কারের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

১। বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে টাকা বার করতে নেই। কাউকে টাকা দিতে নেই। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবার। ঘরের সম্পদ অন্যকে দিলে লক্ষ্মীর অমর্যাদা করা হয়। গৃহকর্তার অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস। এরই ফলশ্রুতিতে ব্যাঙ্কে সেদিন কম ভিড় হয়। দোকানির বিক্রি কম হয়। ভিখারি কম ভিক্ষা পায়।

২। কোনও জিনিস কাউকে তিনটি দিতে নেই। দিলে গ্রহণকারী ব্যক্তি নাকি শত্রু হয়ে যায়।

৩। ঘুমন্ত মানুষকে ডিঙোতে নেই। বিশেষত শিশুকে।

৪। কাউকে বাঁ হাত দিয়ে টাকা দিতে নেই ও নিতে নেই। লক্ষ্মীর অসম্মান করা হয়।

৫। আসন, বাসন ও নিজের গা বাজাতে নেই। বাজালে লক্ষ্মী গৃহ ছেড়ে চলে যান। এই নিয়ে প্রবাদ আছে— আসন বাসন গা তিন বাজাবে না
তিন বাজাবে যখন, লক্ষ্মী ছাড়বে তখন।

৬। লঙ্কা, মরিচ এমন ঝাল জাতীয় জিনিস কারো হাতে দিতে নেই, দিলে ওই ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। এক জায়গায় রেখে দিতে হয় তারপর গ্রহণকারী ব্যক্তি সেখান থেকে প্রয়োজনমতো নিয়ে নেয়।

৭। চালের পাত্র শূন্য করতে নেই। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস ফুরিয়ে গেলে 'নেই' বলতে নেই। বলতে হয় বাড়ন্ত।

৮। রাতের বেলায় সাপ বলতে নেই বলতে হয় 'লতা'। চোর বলতে নেই বলতে হয় 'নিশিকুটুম'। লোকবিশ্বাস এই যে উক্ত জিনিসগুলির নাম করলে সত্যি সত্যিই তাদের আবির্ভাব ঘটবে।

৯। সকালে বাসি মুখে ও ভর সন্ধ্যাবেলা মিথ্যে কথা বলতে নেই। উক্ত সময়ে বক্তার বক্তব্য অবিশ্বাস্য মনে হলে শ্রোতা সাবধান করে দেন— 'সকালে/ভর সন্ধ্যায় মিথ্যা বলছিস!'

১০। রাত্রে জোনাকি পোকা ধরতে নেই, ধরলে পেট খারাপ করে।

১১। গোরুর দড়ি ডিঙোতে নেই। ডিঙোলে গোরুর গলায় ব্যথা হয়।

১২। দরজার চৌকাঠে বসতে নেই। বালিশে বসতে নেই। উভয় ক্ষেত্রেই বসা ব্যক্তির পাছায় ফোঁড়া হয়। বালিশ ডিঙোতে নেই। যার বালিশ তার ঘাড়ে ব্যথা হয়।

১৩। ধুতি গামছা সেলাই করে পরতে নেই। পরলে সংসারে অভাব ঘোচে না।

১৪। খেতে বসে গান করতে নেই, করলে লক্ষ্মীঠাকুর রাগ করে চলে যান।

১৫। হাঁড়ির প্রথম ভাত মেয়েদের খেতে নেই। খেলে লক্ষ্মী অপ্রসন্ন হন। একইভাবে পিঠে-পুলি হলে তারও প্রথমটি মেয়েদের খেতে নেই।

১৬। মেয়ে-বউদের মাসিক হলে তিন-চারদিন সমস্ত শুভ কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। মাসিক শেষ হলে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে পুনরায় তারা শুভকাজে যোগ দিতে পারে।

১৭। অশৌচের সময় তেল সাবান মাখা নিষেধ। এমনকি জামা কাপড়ও কাচতে নেই।

১৮। দা-কাঁচির ওপর বসতে নেই।

১৯। খাওয়ার সময় পাতের গোলমরিচ ফেলতে নেই। গোলমরিচ হারালে দুঃখ হয়। এই একই সংস্কারবশত দোকানিরা রাতে গোলমরিচ বিক্রি করে না।

২০। সন্ধ্যার পর দোকানদার সূঁচ, বড়শি বিক্রি করে না। সকালে বউনি না হলে কাউকে বাকি দেয় না। প্রথম খরিদ্দারের সঙ্গে বেশি দরাদরি করে না।

২১। সন্ধ্যাবেলায় কাউকে চাল ধার দিতে নেই।

২২। মাদুলি তাবিজ ধারণ করে অশৌচ বাড়িতে যেতে নেই। তাহলে মাদুলি তাবিজ নষ্ট হয়ে যায়, কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। রাতে 'মড়া' উচ্চারণ করতে নেই।

২৩। জন্মদিনে চুল নখ ইত্যাদি কাটতে নেই। সন্তানের জন্মদিনেও মাকে নখ কাটতে নেই।

২৪। ভর সন্ধ্যাবেলায় সধবাদের শুয়ে থাকতে নেই। গৃহের অমঙ্গল হয়।

২৫। সধবাকে শাড়ির আঁচল মাটিতে ফেলে বসতে নেই। খোলা চুলে সন্ধ্যেবেলা বাড়ির বাইরে বেরোতে নেই, অপশক্তি ভর করে। খোলা চুল মাটিতে ঠেকিয়ে বসতে নেই।

২৬। অবিবাহিত মেয়েদের চুলে হাত দিতে নেই।

২৭। খালি কলসি নিয়ে রাস্তার দু'দিকে লোক থাকলে তাদের মাঝখান দিয়ে যেতে নেই। লোকদের একপাশে সরিয়ে তবেই জল আনতে যেতে হয়।

২৮। রাতে বাসনের শব্দ করতে নেই। করলে চোর আসে।

২৯। দরজার মাথায় গামছা ঝুলিয়ে রাখতে নেই।

৩০। বাড়ির দাওয়ায় গালে বা মাথায় হাত দিয়ে বসতে নেই। বসলে দেনা হয়।

৩১। রাত্রে আয়নায় মুখ দেখতে নেই।

৩২। রাতে গাছের ডাল কাটতে নেই, পাতা ছিঁড়তে নেই। ফলন্ত গাছ থেকে ফল ছিঁড়তে নেই, তাহলে ফলন কমে যায়।

৩৩। শনিবার, মঙ্গলবার ও রবিবার বাঁশ কাটা নিষেধ।

৩৪। রবিবার নিমের জন্মবার, তাই নিমপাতা খেতে নেই।

৩৫। দুপুরবেলা বাড়িতে অতিথি এলে তাকে না খাইয়ে বিদায় করতে নেই, করলে বাড়ির অমঙ্গল হয়।

৩৬। কারো বাড়ি গেলে একটু হলেও বসতে হয়, নাহলে ওই বাড়ির লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়।

না বসলে ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয় না।

৩৭। সরষে, গোলমরিচ ধার দিতে নেই।

৩৮। স্নান করতে গিয়ে একডুব দিতে নেই।

৩৯। যার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা তাকে শ্মশানে শবদাহ করতে যেতে নেই। প্রাণীহত্যা করতে নেই। করলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হয়।

৪০। দরজার মাঝখানে বসতে নেই, বসে যেতে নেই।

৪১। ভাগ্নে ভাগ্নীকে মারতে নেই। মারলে মামার হাত কাঁপে।

৪২। ছোটো ছেলে-মেয়ের দাঁত পড়ে গেলে পড়ে যাওয়া দাঁত যে-কোনও জায়গায় ফেলতে নেই। ছেলে-মেয়ের হাত দিয়েই ইঁদুরের গর্তে ফেলতে হয়, এবং ওদের মুখ দিয়ে বলাতে হয়— 'ইঁদুর ভাই আমার দাঁতগুলো নাও, তোমারগুলো দাও।' তাহলে ইঁদুরের মতো ছোটো ছোটো সুন্দর দাঁত গজায়।

৪৩। রাতে শিস্ দিতে নেই। দিলে বাড়িতে ইঁদুরের উৎপাত বৃদ্ধি পায়।

৪৪। শূন্য দোলায় দোল দিতে নেই। দিলে ভূত-পেত্নী বসে দোল খায়।

নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত এমন অজস্র লোকবিশ্বাস ও সংস্কার লোকসমাজে আজও প্রচলিত।

অতিথির আগমন সম্বন্ধীয়:

১। হাত থেকে বাসন পড়ে গেলে বাড়িতে অতিথি আসবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

২। বিড়াল পায়ের পাতা চাটলে বাড়িতে অতিথি আসে। পা দিয়ে মুখ মুছলে অতিথি আসে।

৩। দুজনের মুখ দিয়ে হঠাৎ করে একই কথা বের হলে বাড়িতে অতিথি আসে।

৪। হাত থেকে জল খাওয়ার গ্লাস, চিরুনি প্রভৃতি জিনিস পড়ে গেলে বাড়িতে কুটুম্বের আগমন সম্ভাবনা থাকে।

৫। শিশুরা ঝাঁটা নিয়ে ঝাড়ু দেওয়া শুরু করলে অতিথি আসার সম্ভাবনা থাকে। মনে করা হয় শিশুরা ভগবানের অংশ তাই ওরা আগেই আভাস পায়।

ঋণ সম্বন্ধীয় :

১। ছুরি, কাঁচি, দা প্রভৃতি লোহার জিনিস দিয়ে মাটিতে দাগ দিতে নেই, দিলে ঋণ হয়।

২। বাম হাত মাটিতে রেখে খেতে নেই, খেলে ঋণ হয়।

৩। ছুরি, দা প্রভৃতি দিয়ে বাড়ির খুঁটি চাঁছতে নেই, চাঁছলে ঋণ হয়।

৪। খেতে বসে খাওয়ার থালায় কিছু লিখতে নেই বা আঁকতে নেই, করলে ঋণ বাড়ে।

৫। কড়ি বা টাকা হাতের মধ্যে নিয়ে নাচাতে নেই, নাচালে ঋণ হয়।

ভোজন সম্বন্ধীয় :

১। গ্রহণের সময় কোনও জিনিস খেতে নেই। গ্রহণ লাগার আগে খেয়ে নিতে হয়। অথবা গ্রহণ ছাড়ার পর নতুন করে রান্না করে খেতে হয়। গ্রহণ লাগার সময় থেকে যাওয়া আহার্য ফেলে দিতে হয়।

২। মাঘমাসে মূলো খেতে নেই।

৩। সরস্বতী পূজার আগে কুল খেতে নেই, খেলে বিদ্যার দেবী সেই ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর অসন্তুষ্ট হন। এই সংস্কার অনেক মায়েরাও মেনে চলেন।

৪। দুধের সঙ্গে নুন খেতে নেই, খেলে গোরুর বাঁটে ঘা হয়।

৫। বাড়িতে অশৌচ চললে হলুদ, তেল, আমিষ খেতে নেই।

৬। দ্বাদশীতে শাক খেতে নেই। একাদশীতে বেগুন খেতে নেই।

৭। খাওয়া শেষ হলে শুকনো থালা রেখে উঠে যেতে নেই, সামান্য হলেও জল ঢালতে হয়।

৮। মাংস ও দুধ একসঙ্গে খেতে নেই।

৯। অম্বুবাচীর দিন আম ও দুধ অবশ্যই খেতে হয়।

১০। খেতে বসে জিভে কামড় পড়লে বা বিষম খেলে কেউ নাম করছে বলে মনে করা হয়।

১১। স্ত্রীলোকের জোড়া ফল খেতে নেই, খেলে ভবিষ্যতে যমজ সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১২। ভূত চতুর্দশীতে চোদ্দ শাক খেতে হয়।

১৩। অন্ধকারে বসে খেতে নেই, খেলে ওই পাতে বসে ভূতও খায়।

১৪। পরীক্ষা ও অন্যান্য শুভ কাজে বের হওয়ার আগে ডিম, কলা এসব খেতে নেই, খেলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যায় না।

১৫। মেয়েদের পা ছড়িয়ে বসে খেতে নেই, খেতে বসে পা নাচাতে নেই, নাচালে দূরে বিয়ে হয়।

বিবিধ :

১। কোনও কথা বলার সময় যদি টিকটিকি টিক্ টিক্ টিক্ করে তাহলে বিশ্বাস করা হয় যে-কথাটি বলা হচ্ছে সেটি ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে বক্তা তার আঙুলটি মাটিতে তিনবার টোকা মারে।

২। পাখার বাতাস করতে গিয়ে কারো গায়ে পাখার আঘাত লাগলে পাখাটি মাটিতে তিনবার ঠুকে নিতে হয়, নাহলে গায়ে লাগা ব্যক্তি রোগা হয়ে যায়।

৩। কেউ জল চাইলে না বলতে নেই। না দিলে পরজন্মে চাতক পাখি হয়ে জন্মাতে হয়।

৪। সকালবেলা জল ছড়া, ঝাঁট এবং সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে প্রদীপ দিতে হয়। দিলে লক্ষ্মী অচলা থাকেন। না হলে গৃহত্যাগী হন। প্রবাদেই আছে—

সকালবেলায় ছড়া ঝাঁট সন্ধ্যাকালে বাতি
লক্ষ্মী বলেন সেইখানে আমার বসতি।

৫। কাছের লোক সম্পর্কে দুঃস্বপ্ন দেখলে সেই স্বপ্ন দূরের লোকের ক্ষেত্রে ফলে। আবার উল্টোটাও বিশ্বাস করা হয়— দূরের লোক সম্পর্কে দেখা স্বপ্ন আপনজনের ক্ষেত্রে সত্যি হয়।

৬। দুটি হাত এক জায়গায় করলে যাদের হাতের আঙুলের মাঝে কোনও ফাঁক দেখা যায় না, তাদের বলা হয় যে হাত দিয়ে জল গলে না, অর্থাৎ খুব কৃপণ।

৭। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন সারারাত জেগে থাকতে হয়, অর্থাৎ জাগরণ রাত। জাগলে লক্ষ্মী খুশি হন, আশীর্বাদ দেন। নিদ্রা গেলে বিরূপা হন। এই রাত্রিতে চুরি করাও অন্যায় নয়। সেইজন্য কচিকাঁচারা আনন্দের সঙ্গে সারা পাড়ায় এর-ওর বাড়ি চুরি করে বেড়ায়।

৮। কাঁধে রাখা ছাতা খেলাচ্ছলেও ঘোরাতে নেই, ঘোরালে মামার মাথা ঘোরে।

৯। মামার বাড়ির ভাত খেলে ভাগ্নে-ভাগ্নীর আয়ু বাড়ে।

১০। শিশু ঘুমের সময় হাসলে মনে করা হয়— মা ষষ্ঠী খেলা দিচ্ছে। কাঁদলে মনে করা হয় মা ষষ্ঠী বলছেন— তোর বাবা মারা গেছে, আর মা ষষ্ঠী মাঝে মাঝে বলেন তোর ঘরের চালে আগুন লেগেছে বা কাক বসেছে তখন শিশু চোখ মেলে এক পলক দেখে নেয়, আবার চোখ বন্ধ করে।

১১। ঘরের চালে লাউয়ের ফলন ভালো হলে কোনও দুঃসংবাদ পাওয়ার আশঙ্কা করা হয়।

১২। চামচিকের ডানার বাতাস গায়ে লাগাতে নেই। লাগলে চামচিকের মতো রোগা কঙ্কালসার চেহারা হয়।

১৩। গঙ্গাসাগরে গোরুর লেজ ধরে গঙ্গা পারাপার করলে বলা হয় বৈতরণী পার হয়ে পুণ্য অর্জন হল।

১৪। ছিপ ফেলার সময় থুতু দিলে মাছ বেশি পড়ে। মাছ ধরার ছিপ ডিঙ্গোতে নেই। একবার ডিঙ্গালে, আবার উল্টো ডিঙ্গোতে হয়, তাহলে দোষ কাটে।

১৫। প্রস্রাব পায়খানা করা হয়ে গেলে সেই জায়গায় থুতু ফেলে উঠতে হয়।

১৬। কোনও কাজে একা বার হতে নেই, তাহলে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়। আবার একা কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে নেই তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বলা হয় — 'একা না বোকা।'

১৭। বিপদ কখনো একা আসে না। অর্থাৎ একটা বিপদ কাটলেই আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। পাশাপাশি অন্যান্য বিপদ সম্পর্কে সদা সচেতন থাকতে হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার গর্ব সুন্দরবনের জনজীবন মানেই অনিশ্চয়তায় ভরা। মাছ মারা, কাঁকড়া ধরা, মধু সংগ্রহ— প্রতিটি জীবিকা খুবই বিপদসঙ্কুল। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন সবচেয়ে বেশি হতে হয় এই জেলার মানুষকে। তাই আত্মরক্ষার তাগিদেই মানুষ সংস্কারের আশ্রয় নেয়।

সংস্কার ব্যক্তিবিশেষের মানসিকতার ওপর নির্ভরশীল। একজনের কাছে যেটি কু-সংস্কার অন্য একজন বা একাধিক জনের কাছে সেটিই সু-সংস্কার। কোনও কোনও খেলোয়াড়ের আপনজন তার খেলা টিভিতে দেখেন না, না দেখলে তিনি রান করেন, গোল করেন বা ভালো খেলেন। এটি সাধারণের চোখে কুসংস্কার, কিন্তু তাঁদের কাছে 'কু' বাদ দিয়ে শুধুই 'সংস্কার'। এইভাবে সংস্কার পৃথিবীর সবদেশে সবকালে সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে ছিল, আছে এবং অল্পবিস্তর থাকবেও। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো কৃষিভিত্তিক জেলায় তো প্রবলভাবেই থাকবে। একটি পালনীয় সংস্কার একে অন্যের সঙ্গে মানসিক সাজুয্যকে চিনিয়ে দেয়। আত্মিক সম্পর্কের পিছনে সংস্কারের একটি বিরাট ভূমিকা আছে। "জগতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষ যে ক'টি সূত্রে গ্রথিত আছে, তন্মধ্যে সংস্কার অন্যতম।"[৪]

তথ্যসূত্র

১. ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), গতিধারা প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ২০০।

২. ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, প্রথম অবসর প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৬৫।

৩. মানস মজুমদার, লোকঐতিহ্যের দর্পণে, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ৩০।

৪. ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোক-বিশ্বাস ও লোকসংস্কার, পুস্তক বিপণি, পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৪২।